KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 200	Place of Publication : অনুরাগ প্রকাশন ৩৪/2 মাহিম হালদার স্ট্রীট, কল 24
Collection KLMLGK	Publisher ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়
Title অনুরাগ (ANURAAG)	Size 8.5"/5.5"
Vol. & Number 3 4 5 6	Year of Publication : আশ্বিন ১৪০১ অনুমানি ১৯৯৫ মে ১৯৯৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪
	Condition : Brittle Good ✓
Editor ধীরা চট্টোপাধ্যায়	Remarks

CD Reel No. KLMLGK

অনুরাগ

ষষ্ঠ সংকলন : আশ্বিন ১৪০২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রতিষ্ঠাতা : বিশ্বনাথ ঘোষ। সভাপতি : উদিতেন্দ্রপ্রকাশ মল্লিক

পৃষ্ঠপোষক : শান্তি রায়, দীপালী চৌধুরী, কমলপাণি রায়চৌধুরী
অপরেশ সেন

অনুরাগ

ষষ্ঠ সংকলন : আশ্বিন ১৪০২ বঙ্গাব্দ

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

বিটিশ ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উপদেষ্টা : প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সম্পাদক : ধীরা ভট্টাচার্য

সহযোগী : জয়ন্তী সান্যাল, বিউটি মজুমদার, মীনা বসু, অর্চিতা রায়চৌধুরী

সাংগঠনিক-প্রধান : ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন

৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

ষষ্ঠ সংকলন : আশ্বিন ১৪০২
সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

রাগানুগ। কাগজের দাম ৩
খোলা চিঠি। বিশ্বনাথ ঘোষ ৪
মতামত। পঙ্কজ ভট্টাচার্য ৪
পুস্তক পরিচয়। পুলকেশ শাণ্ডিল্য, ধীরা ভট্টাচার্য
বিশ্বনাথ ঘোষ, ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
আমেরিকার চিঠি। কৃষ্ণা রায় ১০
মা। নগেন নিয়োগী ১৭
শ্রীমতীর সৌজন্যে। মাণিক শেঠ ১৯
তাসের ঘর। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ২৪
ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফেরা। বিমলকুমার ভট্টাচার্য ২৫
যোগাযোগের কুমুদিনী। ধীরা ভট্টাচার্য ২৮
গৃহহারা। ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১
এখনও এখনই। বিউটি মজুমদার ৩২
শান্তির তপোবনে কাব্যিক শক্তি। অশোক সাহা ৩৩
সখী সংবাদ। সুধা চট্টোপাধ্যায় ৩৩
অভিমান। হরিকুমার ভট্টাচার্য ৩৪
দরদী কবি শক্তি। নিতাইচন্দ্র দত্ত ৩৫
বেলা শেষ। গৌতম সরকার ৩৫
অনুরাগে ছড়াপত্র। মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ৩৬
কার ভয়ে? বিষাণ রুদ্র ৩৭
গানের ভিতর দিয়ে। অমর চক্রবর্তী ৩৭
কৈশোর। অতীন্দ্রচন্দ্র রায় ৩৮
মহাজীবন। রণজিত মিত্র ৩৯

মাইতি প্রেস, ৫১বি, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত।
পাঁচ টাকা।

কাগজের দাম

এমন ভাবে কাগজের দাম বেড়েছে যে আজ সারা ভারত জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। এ সমস্যা আমাদেরো গায়েও এসে লেগেছে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের পাক্ষিক মুখপত্র 'নিউজ লেটারে' ভলুম-১১, সংখ্যা-১, সম্পাদক শ্রী অরবিন্দ কুমার লিখেছেন,—'বুকস্ আর দেয়ারফোর থ্রেটেনড্ নট বাই দি ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বাট ফ্রম উইদিন, বাই দা রাইজিং প্রাইস্ অব পেপার।' চার্ট দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন,—১৯৬৭-তে যে কাগজ ১ কেজি দাম ছিল টা ১.৯০, তা ১৯৮৯-তে হয়েছে ১৯ টাকা, ১৯৯৫-তে তার দাম দাঁড়িয়েছে ৩৩ টাকা। তাই বইপত্র প্রকাশ হওয়া মাথায় উঠে গেছে।

আমাদের সমস্যা আরো গুরুতর। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন সাধারণত সমবায় ভিত্তিতেই চলে। এ দায়িত্ব তাই সবার। আমরা খুব হিসেব করে দেখেছি,—একটি এক পৃষ্ঠার কবিতা ছাপাতে কাগজ নিয়ে ছাপা খরচ পড়ে প্রায় ৫০ টাকা। ছয় পৃষ্ঠার একটি গল্প বা প্রবন্ধের খরচ পড়ে ৩০০ টাকা। 'অনুরাগে'র প্রতি যারা অনুরাগী তাঁদের এ কথা মনে রেখে লেখা জোগাড় করতে হবে। অনুরাগের বান্ধবেরা যদি বছরে ছ'হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলেই অনুরাগ নিশ্চিন্ত হতে পারে। 'অনুরাগ-' এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। তবেই 'অনুরাগ' নিয়মিত প্রকাশ সম্ভব হবে।

'অনুরাগ' আগের মতই তার সংকল্পে স্থির থাকতে চায়। 'অনুরাগ' চায় বাংলা ভাষার যেন অনাদর না হয়। 'অনুরাগ' বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রহরী। সে তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই দায়িত্ব পালনে ব্রতী।

খোলা চিঠি

কবি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী সিলেট, বাংলাদেশ

প্রীতিভাজনেষু, আমার বিশেষ বন্ধু প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লেখা আপনার ৩.৬.৯৫-এর চিঠি দেখে খুব আনন্দ হল। কিছু কথা আপনাকে বলার জন্য মন উদ্বেলিত হচ্ছে।

আপনার আমার মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিস কিন্তু ভাষা। উভয় বাংলার ভাষাকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যেন এক রকমই থাকে। তা না হলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব, আমাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামী শক্তিকে হারিয়ে ফেলব। "আকাশের নিচে কখন কী হয় যায় না বলা, হয়ত শুনব—আমরা আবার একই হব।"

বাংলাদেশ ভাষা নিয়ে যখন আন্দোলন করেছে তখন কিন্তু অঙ্ক কষে রাখে নি যে, এই দিয়ে আমরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তুলব। বাংলাদেশ সজাগ ছিল বলেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে, আর উভয় বাংলার বাঙালীরা গর্বের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষাকে ষষ্ঠ স্থানে বসাতে পেরেছি।

এই সূত্রে জানাচ্ছি, 'অনুরাগ' কোন রাজনৈতিক দলের অনুগামী নয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনাকে আকাদেমিক পর্যায় দেখে 'অনুরাগ'।

—বিশ্বনাথ ঘোষ, কলকাতা ২০-৭-৯৫

মতামত

'অনুরাগ' ৫ম সংকলনে ধীরা ভট্টাচার্যের 'পুরুষ-প্রকৃতি প্রেম-পরামাত্মা' পড়ে ভাল লাগল।...দেহগত কামনার বন্ধনে নয়, কেবল ভাবাদর্শের মিলনই যে প্রকৃত সত্য—এই পরম তথ্য যখন পাঠক-পাঠিকা অনুভব করতে পারবেন তখনই এ প্রবন্ধের সার্থকতা। দীপালী চৌধুরীর 'স্মৃতিতীর্থ সেলুলার জেল' পড়ে অনেক অজানা তথ্য জানা গেল।

—পঙ্কজ ভট্টাচার্য, হরিনাভি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

পুস্তক পরিচয়

□ মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা—শওকত ওসমান। প্রাপ্তিস্থান—আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ দুই ডলার।

মাত্র পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ছোট্ট এই বইটিতে মনস্বী কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান বলতে চেয়েছেন: চব্বিশ বছর ধরে মৌলবাদীরা পাকিস্তানের শাসকদের দালালী করেছে। ওরা কী বাঙলাদেশের রাষ্ট্রের জন্ম তথা অভ্যুদয় ঠেকাতে পেরেছে?? পারে নি।.... 'সবার উপরে মানুষ সত্য'-এই কথাই বলেছেন লেখক। উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়েছে,—'সমীহার পরম অধিকতায় ধর্মান্ধতা-সৃষ্টি-কারী সোশ্যাল ফোর্সের বিরুদ্ধে হিমালয়-সদৃশ যুগল পাহাড়-পুরুষ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম মহান স্মৃতির উদ্দেশে।' 'অনুরাগ' শতমুখে লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

□ গল্পলতা। সম্পাদনা—বিভাস দত্ত, পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়াস সত্য ডাক্তার রোড, কলকাতা-২৩ দশ টাকা।

ছ'টি গল্পের এই দ্বিতীয় পর্ব কথাসাহিত্যিক হরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিককে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই পর্বে গল্প লিখেছেন বিভাস দত্ত, সমর দত্ত, পরিতোষ বসু, পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, মায়া চট্টোপাধ্যায়, তাপসরঞ্জন পাল। গল্পলেখকদের এই সমবায়-প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে আমরা আরো আশা রাখি।

□ বিচিত্র পশু জগৎ—শ্রীমতী জয়ন্তী সান্যাল। অনুরাগ প্রকাশন, কলকাতা-২৬ দশ টাকা।

'পাখীর জগৎ বর্ণসম্ভার'-এর পরে এটি শ্রীমতী জয়ন্তী সান্যালের দ্বিতীয় বই। এর সূচীপত্রে আছে—তিমি, ডলফিন, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, গণ্ডার, বাঘ, কচ্ছপ, সিংহ, হাতী, জংলী ঘোড়া-গাধা, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি। লেখিকার ঢিলেঢালা স্বাভাবিক সরলতা মাখানো বর্ণনা বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

□ ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা—সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য। শ্রী গোবিন্দ পাবলিশার্স ১৮ নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-১ থেকে গৌরী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। কুড়ি টাকা।

শ্রী ভট্টার্যের কাব্যগ্রন্থ 'কপোতাক্ষ' 'বেঁচে থাকা মানুষ' প্রেমের গল্প 'পূর্বরাগ' 'হারিয়ে যাওয়া দিনের গল্প' পদ্যে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী', অপূর্ব সুন্দর 'গীতা অমৃত' পড়ে আমরা আগেই তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত। 'ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা'য় ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত ও দর্শন নিয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন। বয়স্ক লেখকের অভিজ্ঞতার নিদর্শন রয়েছে সর্বত্র।

□ সত্তার উদ্ভিদে—প্রণব দাশগুপ্ত। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগণা (দঃ) প্রচ্ছদ: চারু খান। কুড়ি টাকা।

কবি প্রণব দাশগুপ্তের ছাব্বিশটি কবিতার এই সংকলন নবান্নের ঘ্রাণে আজও শালুখের খোঁজে মারীচ সময়ে মাঝরাতে কড়া নাড়ে। অরণ্য তর্পণ, জব্বর নামা, ছেঁড়া ক্যালেণ্ডার, প্রীতিদির পিস্তল আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। মনের রাখবার মতো: 'লিকলিকে মুঠো দুটো খুলতে চেয়ো না কেউ/ওর মাঝে এদেশের প্রাণের ভোমরা / প্রজ্ঞা আর প্রতিবাদ ঘুমিয়ে রয়েছে।'

□ নষ্ট হরফ—সিতাংশু গোস্বামী। উৎসব প্রকাশনী ১৯৮ বহরমপুর রোড, বিবেকানন্দ পল্লী, রানাঘাট, নদীয়া। প্রচ্ছদ: রতন শর্মা। চার টাকা।

'নষ্ট হরফ' সিতাংশু গোস্বামীর দশম কবিতা সংকলন। এতে ছয় পংক্তির আটটি কবিতা আছে। সাদা পারাবত মুখ থুবড়িয়ে পড়ে আছে ভূমিতলে। আমরা কবির কাছে ভবিষ্যতে আরো ভাল কবিতা আশা করি।

পুলকেশ শাণ্ডিল্য

□ Au-Revoir Calcutta—Krishna Datta. রূপা এণ্ড কোং, কলকাতা-৭৩, ১৯৫ টাকা।

Au-Revoir Calcutta, বাংলা প্রতিশব্দ আরিভয়ুরে মানে বিদায় সম্ভাষণ। কলকাতাকে বিদায়। লেখিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত। উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও ঘটনার উপস্থাপনা মনকে আকর্ষিত করে রাখে। ফ্ল্যাস ব্যাকে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে এবং লেখিকা মুন্সিরানার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ইউরোপীয় সমাজে লালিত পালিত মিরান্দার কাছে কাকার ছেলেকে ভালবাসা কোন গর্হিত অপরাধ বলে মনে হয়নি। রানার মৃত্যু তাকে আহত করেছিল। না দেখা কাকিমার প্রতি তার সমবেদনা ও সহানুভূতি লেখিকা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পুত্র হারানর শোক কাকিমা শোকোচ্ছাসের মধ্যে প্রকাশ করেননি, তা বিকৃতরূপ নিয়েছিল মিরান্দাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করার মধ্য দিয়ে। ভালবাসা প্রতিহত হলে, সে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যেই হোক অথবা নিকট প্রিয়জনের মধ্যেই হোক তা মানুষকে ক্ষিপ্ত, বিচার-বুদ্ধিহীন করে তোলে। রানা মিরান্দার প্রেম সুসানকে পাগল করে দিয়েছিল। ফলে রানাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কাকিমা বর্ষীয়সী মহিলা হয়েও কন্যাসম মিরান্দাকে সহ্য করতে পারেন নি। রানাকে হারানোর ব্যথা, রানার জন্ম, কাকিমার ক্রোধ এ সব কিছুর তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে মিরান্দাকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। মিরান্দার জীবনের ট্রাজেডি সুন্দর ভাবে লেখিকা বর্ণনা করেছেন। বইটির নামকরণ সার্থক।

ধীরা ভট্টাচার্য

□ নানা রঙের দিনগুলি—শ্রীমতী সুরভি ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থান—ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২১৭ পৃষ্ঠা, ১০০ টাকা।

আট দশকের আলগা খাতায় লক্ষজনের মনের কথা। কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজের খানদানি স্মৃতিকথায় ভরপুর। ১৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ৩৬টি ছবির মধ্যে ৪টি রঙিন। ঠাকুর পরিবারের, ভট্টাচার্য পরিবারের, চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বংশলতিকা রয়েছে। লেখিকা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন অনেকের কাছে। তার মধ্যে বম্বের সলিল ঘোষ, কলকাতার সুজাতা ভট্টাচার্য (কনিষ্ঠ ভগ্নী) তাঁর কন্যা 'অনুরাগে'র ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। গবেষণার কাজে লাগবার মত একখানি বই। পড়ে অনেক খবর পাওয়া যায়। নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়ান।

বিশ্বনাথ ঘোষ

□ পান্ডুলিপির নায়িকা—তেজেন্দ্রলাল মজুমদার। প্রথম প্রকাশ ১লা আষাঢ় ১৪০১ প্রকাশিকা শ্যামলী মহাপাত্র, পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন্স। কলিকাতা-৩৯, ত্রিশ টাকা।

'অনুরাগ' বাংলা ভাষার অতন্দ্র প্রহরী। বাংলায় ও বাইরে বাংলা ভাষার প্রচার, প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি তার লক্ষ্য। প্রকৃত পক্ষে বাংলা ভাষায় অনুরাগ থেকেই এই গোষ্ঠীর অনুরাগ নামকরণ। তাই মধ্যপ্রদেশের রামপুর থেকে শ্রীতেজেন্দ্রলাল মজুমদারের রোমান্টিক গল্প সংকলন 'পান্ডুলিপির নায়িকা' যখন আমাদের হাতে এসে পৌঁছল তখন আমরা স্বভাবতই আনন্দিত হলাম।

বইটিতে মোট দশটি গল্প আছে। প্রধান গল্পটি, অর্থাৎ

সপ্তম গল্পটির নামেই বইটির নামকরণ। গল্পের প্লটগুলি অভিনবত্বের দাবী রাখে। কোথায় কোথাও গল্পের 'ট্রিটমেন্ট' এবং শব্দচয়নের দক্ষতা,—যেমন 'শব্দিত শিহরণে শিহরিত' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বিষকন্যা, অরণ্য কুহেলী, পান্ডুলিপির নায়িকা, পঙ্ককমল প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। বিভিন্ন পটভূমিতে লেখা হলেও মধ্যপ্রদেশের বাঙালী জীবনের ছবি বেশীর ভাগ গল্পের মধ্যেই ফুটে উঠেছে। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি, মানসিকতা, সংস্কার—এক কথায় 'অরণ্য সংস্কৃতির' বিষয়ে বহু অজানা খবরেরও সন্ধান পাওয়া যায় ঠাস-বুনোট গল্পের ফাঁকে ফাঁকে। এটা পাঠকদের উপরি পাওনা। বিষকন্যা গল্পটি অত্যন্ত বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক আজকের দিনে। মধ্যপ্রাচ্যে টাকার লোভে ছুটে যাওয়া ও তারপর শেখেদের কবলে পড়ে আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়ার করুণ ইতিহাস মানুষকে যথার্থই ভাবিয়ে তোলে। পান্ডুলিপির নায়িকা গল্পটিতে লেখার মুন্সীয়ানা থাকলেও যেন খানিকটা অবাস্তবতার ছোঁয়া এসে পড়েছে।

প্রচ্ছদ সুদৃশ্য। কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ পীড়াদায়ক। তাছাড়া 'বিসঙ্গতি' 'দর্শকদর্শকী' ইত্যাদি শব্দগুলি অপরিচিত হওয়ায় কানে লাগে। ইংরেজী শব্দের বাংলা বানানগুলিও অনেক সময় প্রচলিত বানানের মত নয়। যেমন হ্যামারেজ (হওয়া উচিত হেমারেজ) এ্যামারজেন্সী (এমারজেন্সী) ইত্যাদি।

গত চল্লিশ একচল্লিশ বছর বাংলার বাইরে বাস করেও যে নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক সাহিত্য-চর্চা অব্যাহত রেখেছেন তাতে তিনি যে কোন বাংলা ভাষা প্রেমিকের কাছ থেকেই সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকার চিঠি কৃষ্ণা রায়

শ্রীচরণকমলেষু মা,

মানুষের জীবনচক্র নানাভাবে ঘোরে, সেই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়ে আমার জীবনের চাকা একবার ঘুরে আমার ভ্রমণ চক্রকে এক ধাক্কায় ঠেলে আমেরিকায় পেঁছে দেয়। সেটা ১৯৮০ সাল। এপ্রিল মাস। প্রচণ্ড গরম। সঙ্গে আমার কন্যা ছোট্ট নন্দিনী। বছর দশেক বয়স। যাবার তোরজোর চলছে। রাত দশটায় এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে কলকাতা থেকে জাপান। জাপান থেকে জাপান এয়ার লাইন্স প্লেনে আমেরিকা। গন্তব্যস্থল লস-এঞ্জেলস।

মানচিত্রে আমেরিকা ও ইউরোপের ছবি দেখেছি। যখন দেখেছিলাম তখনও ভাবিনি এত দূরদেশে একদিন যাব। যখন সত্যি সেটা ঘটতে চলেছে তখন সবকিছু ছবির মত ঘটে গেল। এবং আমরা মা ও মেয়ে দুর্গাশ্দুর্গা বলে প্লেনে উঠলাম রাত ৯-৪৫ মিনিটে। প্লেন ছাড়ল ১০-১৫ মিনিট নাগাদ। এর আগে কলকাতা বোম্বে প্লেনে চড়েছিলাম। কিন্তু এত দূরপথে ভ্রমণ এই প্রথম।

রানওয়ে ছাড়িয়ে জেটপ্লেন তীব্রগতিতে আকাশপথে উঠে পড়লো। বিরাট পাখী দুটো বড় ডানা মেলে আকাশকে আলিঙ্গন জানালো রাতের আঁধারে। ডানার শেষে এয়ার ইণ্ডিয়ার চিহ্ন মূর্ত্তিটিও অবনত মস্তকে পথকে জানালো তার সাদর সম্ভাষণ। বড় পাখীটার সারা গায়ে প্রায় ১০০টি জানালার আলোগুলো মনে হয় হীরের মত জ্বল জ্বল করছে অন্ধকারে। ভেতরে ২৫০ জন যাত্রী পাইলট ও হোস্টেস সহ। "সিট বাঁধা" চিহ্নের দিকে তাকিয়ে সবাই বসে। বাঁধন খোলার সংকেত আসার সঙ্গে সঙ্গে বিমান সেবিকারা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বাঁধন না

খোলা ভালো বলে জানাতে আমরা দুজনেই সারা পথ বেল্ট বেঁধেই এলাম।

আকাশে উঠবার পর মিনিট ৮/১০ সবাই একটু শান্ত ও চুপচাপ ছিল। তারপর ক্রমশঃ যাত্রীরা বেল্টের বাঁধন খুলে এদিক-ওদিক প্রয়োজনমত ঘোরাঘুরি শুরু করল। খানিক পরে আমাদের জন্য এল নানারকম তরল পানীয় ভরা ট্রে। তাতে লেবুর রস। টমেটোর রস, আপেল রস, ঠাণ্ডা সোডা মিশ্রিত মিষ্টি জল ও বাদাম ভাজার ছোট্ট একটি প্যাকেট। সেটা সবার খাওয়া হলে ঘণ্টাখানেক পরে এল রাতের খাবার। আমার কাছে তা যথেষ্ট বলেই মনে হল। একটা ট্রেতে স্যালাড ও একটু মিষ্টি ভাত, চিংড়ীর তরকারি, অল্প পাঁচ মিশালী তরকারী। একটি গোল রুটি, মাখন, ছোট বাটিতে রসমালাই ও ছোট ছোট মোড়কে চিনি নুন ও মরিচ। যার যেমন প্রয়োজন ব্যবহার করতে পারে। খাওয়া শেষ হতে সব আলো নিবিয়ে ঘুমের ব্যবস্থা করা হল, ছোট সীটে যে টুকু হাত-পা মেলতে পারা যায় তাতেই ঘুমের চেষ্টা মাত্র। কেউ কেউ দিব্যি কম্বল টেনে গভীর ঘুমে অচেতন হবার চেষ্টা করছেন। আমরাও সে চেষ্টা থেকে বিরত রইলাম না। একটু ঝিমিয়েছি ওমনি প্লেনটা খড় খড়, মর মর করে দুলতে আরম্ভ করল। ভাবলাম গেল বুঝি এত বড় প্লেন! কি হবে? একটু পরে পরেই সেই বিরাট প্লেনের দুলুনিতেই ঘুম মাথায় উঠে নানা চিন্তা এলোমেলো ভাবে আসতে লাগল। ভাবলাম এ যাত্রায় কিছু হলে আর কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হবে না। মনটা বেদনায় মুষড়ে গেল। এ ভাবে খানিকক্ষণ চলার পর প্লেনের দোলা বন্ধ হল। তারপর ভাবছি জানলার বাইরে কেমন দেখার জন্যে খুলতেই শুধু প্লেনের পাখার লাল আলোটার টিপ টিপ করে জ্বলা ছাড়া অসীম অনন্ত আঁধারে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না— প্লাস্টিকের পাল্লা টেনে জানলা বন্ধ করে ঝিমোনোর চেষ্টা করলাম। মেয়েটা মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ করছে, এদিক-ওদিক

তাকাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে না। যদিও ভারতের সময়ে প্রায় রাত ১টা বাজে আমার ঘড়িতে। নানা চিন্তা মাথায় নিয়ে মেয়েটাকে কম্বলমুরী দেবার চেষ্টা করছি, বার বার ভয় যদি ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয় কারণ প্লেনের ভিতরে এয়ারকণ্ডিশন বেশ ঠাণ্ডাই রাখা হয়। ভারতের সময়ে রাত ২-৩০ নাগাদ আমরা হংকং-এ নামছি এক ঘণ্টার জন্য। প্লেনটা ক্রমশঃ সাঁইত্রিশ হাজার ফুট থেকে নামতে শুরু করল। খানিক বাদে নীচে একটু ভোরের আলোতে সমুদ্র জলের ছোট ছোট ঢেউ চোখে পড়ল। ক্রমশ তা স্পষ্টতর হল। দু'পাশে সমুদ্র রেখে মাঝ পথ দিয়ে রানওয়ে গড়িয়ে প্লেনটা এসে থামলো হংকং এয়ার পোর্টে। ভারী সুন্দর লাগছিল ভোরের শান্ত পরিবেশ। দু'পাশে দূরে সমুদ্র মাঝে বড় পথ, তারপাশে সবুজে ঘেরা বিশাল ফাঁকা জমির মধ্যে রানওয়ে। সেই শান্ত ভোরে অভিজ্ঞ পাইলটের ধীরে ধীরে রানওয়ে ছুঁয়ে থেমে যাওয়া খুব স্বস্তির হয়েছিল। হংকং একঘণ্টা বিশ্রাম করে আমরা টোকিও উদ্দেশ্যে রওনা হবার অপেক্ষায় রইলাম। এক ঘণ্টা ২০ মিঃ বাদে প্লেন ছাড়ল হংকং থেকে। যতক্ষণ হংকংয়ে থেমেছিল সেই সময় কিছু নতুন যাত্রী উঠলেন ও কিছু যাত্রী নেমে গেলেন। প্লেন পরিষ্কার করা হল, বাইরে সামান্য দিনের আলোয় ব্যস্ত কর্মীদের আনাগোনা, কারো হাতে কাগজ পেন, কারো হাতে ওয়াকিটকি। এর মধ্যে কয়েকজন এসে ভেতরে ঝেড়ে মুছে দিয়ে গেলেন। আবার বিরাট দরজার পাল্লা-গুলো বন্ধ হল। "সিট বাঁধ" চিহ্নের আলো জ্বলে উঠল ও সবাই সোজা হয়ে উঠে বসলেন। প্লেন রানওয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে ট্যাক্সি পথের শেষ এসে থামল। এবার জেট ইঞ্জিনগুলো পুরোদমে চালান হল ও ভীষণ শব্দে দ্রুতবেগে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেন আকাশের পথে উঠে পড়ল। আবার সবাই চুপচাপ। মিনিট দুয়েক পর বিমান সেবিকারা বেল্ট খুলে উঠে গেল প্লেনের ভেতর। সবাই যেন ঝিমুচ্ছে বলে মনে হল। এখন ভারতীয় সময় প্রায়

ভোর ৪টে। সবারই চোখে যেন ঘুম জড়ান। ভেতরে সবাই প্রায় সিটে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। ৩৪ হাজার ফুট ওপরে প্লেন ছুটে চলল টোকিওর পথে। এ পথটুকু সারাক্ষণই প্লেনটা দুলতে দুলতে এল, কিছুক্ষণ থামে আবার শুরু হয় দোলা। অতবড় একটা প্লেন খড় খড় করে আওয়াজ করে দুলে উঠলে ভেতরে শান্ত হয়ে বসা যায় না।

ঘণ্টা চারেক পার হবার পর এবার টোকিও নামার কথা ঘোষণা করা হল। মধ্যে একবার খাবার দেওয়া হল। এয়ার ইণ্ডিয়ার খাবার বেশ ভাল ছিল। এবার আমাদের খাওয়ার তেমন ইচ্ছে হল না। ফেলে-ছড়িয়ে কিছু খেলাম ও আধা ঘুম ও আধা জাগরণের মধ্যে সময় কাটিয়ে জাপানের আকাশে এসে পৌঁছলাম ও নিচে নামার জন্য সবাই প্রস্তুত হলাম। গেলাস পাত্র নিয়ে গেলেন বিমান-সেবিকারা। খাবার টেবিল বন্ধ করে আবার সবাই বেল্ট বেঁধে হেলান-চেয়ার সোজা করে উঠে বসলাম। নীল ও সাদা মেঘের স্তর ভেদ করে আমাদের প্লেনটা আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগলো। নীচে ছোট ছোট জলের ঢেউ ও সমুদ্র দেখা গেল। একটু পরেই এয়ারপোর্টের আলো গুলো চোখে পড়লো ও ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠে রানওয়ে চোখে পড়লো। এই প্রথম পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ জাতির দেশে পদার্পণ করতে চলেছি, মনে নানা চিন্তা-ভাবনার ঢেউ উঠছে। আস্তে আস্তে প্লেনটা জাপানের মাটি ছুঁয়ে এসে থামলো পূর্ব-চিহ্নিত স্থানে। সিঁড়ি নিয়ে এসে জুড়ে দিল প্লেনের দরজার সামনে।

কলকাতা ছেড়ে এই প্রথম বিশ্বের অন্য এয়ার পোর্টে এলাম। ভিতরে গিয়ে অবাক লাগলো। কি ভীষণ পরিস্কার, বিপুল আকার ও প্রাচুর্য্যে ভরা। আমাদের দেশের বাড়ী ঘর ধোওয়া-মোছার পর যেমন পরিস্কার থাকে তেমনি পুরো পোর্টটাই পরিস্কার। কোথাও একটা কাগজ ও একটু ধুলো নেই, মাঝে মাঝেই এক

একটা টিনের মুখ খোলা গোলপাত্র। তাতে সবাই ফেলার জিনিষ ফেলছে। এদেশে ঐ টিনগুলোকে বলে "গারবেজ ক্যাপ" যাতে প্লাস্টিকের ব্যাগে সব জিনিস ফেলা হয় ও পরে একটা ঠেলা-গাড়ীতে প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো ভরে নিয়ে ফেলে দেয়। এত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আমায় অবাক করে দেয়। বড় থেকে ছোট কেউ নিয়ম ভাঙ্গছেন না। নিয়ম মানতেই তারা শুধু জানে, তাই বিশৃঙ্খলা সেখানে নেই। একটু হেঁটে ভেতরে গিয়ে বিশাল বিশাল কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে এয়ার পোর্ট চোখে পড়ে। দিনের আলোয় দুটো রানওয়ে চোখে পড়ল, যাতে প্রতি মিনিটে একটা প্লেন নামছে ও একটা উড়ছে। আমাদের ছোট রানওয়ে দেখা ছিল। এখন বিশাল এয়ার পোর্ট বিপুল আকৃতি প্লেন ও বিরাট রানওয়ে দেখে অবাক বিস্ময়ে পথ এগিয়ে চলতে লাগলাম।

আমাদের পরের প্লেন বিকেল ৬ টায় উড়বে লস এঞ্জেলেস-এর উদ্দেশ্যে। হাতে ছয়-সাত ঘণ্টা সময়। আমাদের জাপানের ভিসা না থাকায় পোর্টের বাইরে যাওয়া অনুমতি ছিল না, কাজেই পূর্বনির্দ্ধারিত বিশেষ পথ ধরে এসে আরেক পাশে থামলাম যেখানে আমাদের অপেক্ষা করতে বলা হল। এখান থেকেই বিকেলের জাপান এয়ার লাইনস ছাড়বে। বসার জন্য বড় বড় চেয়ার যার হাতল নেই, এক সঙ্গে চারজন বসতে পারে বা একটু শুতেও পারা যায়। এখানে বসে মা-মেয়ে ভাবলাম একটু ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়া যাক। কিনতে গিয়ে "হাজার ইয়েন" শব্দ শুনে থতমত খেয়ে গেলাম। ডলার ও ইয়েনের হিসেব না জানায় এই বিভ্রান্তি, শেষে ডলার দিয়েই মেয়ের জন্য কোক কিনে আনলাম।

হাতে সময় থাকায় ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে মা-মেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। যেখানে বসে আছি তার মাথার ওপর আল্গো একটা তলা রয়েছে, সমস্তটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা। শব্দও শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু জাপানী ছেলে-মেয়েদের দেখা যাচ্ছে, বাচ্চারাও খেলা করছে ওপরে। দেখা যাচ্ছে সব কিন্তু

শোনা যায় না কিছুই। নীচে সারি সারি বড় বড় দোকানে লেখা আছে "ডিউটি ফ্রি" এতবড় লিকারের দোকান এর আগে কখনও দেখিনি। কত রকম আকার। রং ও সংখ্যায় এত বোতল এই প্রথম দেখলাম। এতবড় হুইস্কির বোতল এই প্রথম দেখলাম যার দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় ফুট। প্রস্থও অনুরূপ। নানা ধরনের পানীয় যার বেশীর ভাগ নামও জানি না। ড্রিঙ্কের এত বিশাল আয়োজন পর পর দোকান ভর্ত্তি শুধু পানীয়ের ছড়াছড়ি। এ ছাড়া নানা ধরনের খেলনার দোকান, জামা কাপড় ও মুক্তোর গহনার দোকান, এত রকমারি সাইজের ও এত রঙের মুক্তো কখনও দেখিনি, ছোট বড় নানা সাইজের মুক্তো যার রং ধবধবে সাদা, একটু ঘি রঙের, গোলাপী ধরনের ও কালো রঙের কত সুন্দর ভাবে সাজান রঙ বেরঙের মুক্তোর মালা। পর পর মুক্তোর দোকান। জাপান মুক্তোর জন্য বিখ্যাত। নানা দোকান দেখে ক্লান্ত হয়ে এসে বসলাম। একটু পরে মুখ হাত ধোয়ার জন্য বাথরুমের দিকে গেলাম। দরজা খুলতেই অবাক হলাম। বিরাট দেওয়াল জুড়ে আয়না ও সামনে একটি ডিভান পাতা, পরের ঘরে প্রথমে পর পর ১৫/২০টা বেসিন, সাবান, কলে গরম ও ঠাণ্ডা জল, দেওয়াল জোড়া আয়না, পেপার টাওয়েল যা প্রত্যেকে আলাদা ব্যবহার করে ফেলে দিচ্ছে। তারপর ১৪/১৫টি বাথরুম তার মধ্যে দুটি দেশী স্টাইলেরও আছে এবং অতি শুকনো ও পরিস্কার। সহসা মানসচক্ষে ভেসে উঠলো কলকাতার পথে দেখা খোলা বাথরুম যেখানে ছেলেরা সব সময়েই ব্যবহারে ব্যস্ত। কি ভয়ঙ্কর সেইখানকার বাতাস, মনে হল সেই বিষাক্ত গন্ধময় বাতাস বৃদ্ধ, শিশু, যুবা সবাই বিনা প্রতিবাদে নিত্যগ্রহণ করছে। এরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেমন অতি সচেতন আমরা যেন সে বিষয়ে ততো অচেতন। আমরা কেন এমন পরিস্কার রাখতে পারি না ভেবে দুঃখ হল। মুখ, হাত-পা ধুয়ে কলকাতা থেকে আনা সন্দেশ নিয়ে জলযোগ সারা হল। বসে আছি, তিনজন জাপানী

ভদ্রমহিলা আমার কাছে এসে আমার ভারতীয় শাড়ী, কপালে টিপ ও হাতে গয়না সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন। আমাদের পুরনো সভ্যতা বজায় রেখে আমরা নিজেদের জাতীয় পোষাক পরে বিশ্বের সামনে হাজির হই। তার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সারা পৃথিবীতে শাড়ীর যথেষ্ট কদর। জাপান থেকে বুঝতে পারলাম। এঁরা শাড়ী দেখে ইণ্ডিয়ান বলে সনাক্ত করতে পারে সহজেই। আরো কিছুক্ষণ বই পড়ে ও বসে থেকে পরবর্ত্তী যাত্রার জন্য কাস্টমস্ লাইনের দিকে এগিয়ে রইলাম। সামনেই থাকায় তাড়াতাড়ি কাষ্টাম ও চেকিং শেষ করে বোর্ডিং পাস নিয়ে ভেতরে এসে বসলাম। এবার জাপান এয়ারের প্লেন "জাল"-এ আমেরিকা রওনা হওয়ার পালা।

(ক্রমশ)

আমাদের শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

লক্ষ্মী বস্ত্রালয়

১০০/এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

(বসুশ্রী সিনেমার পাশে)

অর্ধশতাব্দীর উপর সুপরিচিত প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা

মা

ডাঃ নগেন নিয়োগী

মাতৃহীনতা একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় কোন কোন মানুষের পক্ষে। আমার বন্ধু অমল মাতৃহীন ছোট বেলা থেকে। সে জন্য তার ব্যথার সীমা ছিল না। অমল আর আমি ছোট বেলা থেকেই এক সঙ্গে পড়াশুনা করেছি পাঠশালা ও মাইনর স্কুলে।

অমল ছোটবেলায় মামা বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। ওর বাবাকে অমল দেখেনি শিশুকাল থেকে। বাবা মারা গেছেন মাকে রেখে অনেক দিন। তখন অমলের মামা বিধবা বোনকে এক নগন্য পল্লী থেকে নিয়ে আসে। অমলের চেহারায়—চোখে মুখে কেমন একটা নিস্পৃহতা সব সময় ফুটে থাকতো। এই নিস্পৃহতার জন্য ওকে সবাই পছন্দ করতো।

অমলের মামার এক প্রতিবেশীর মেয়ে কমলা—কেন যেন অমলকে খুব পছন্দ করতো। সে অমলের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। অমলকে অমলদা বলে ডাকতো কমলা। মাঝে-মাঝেই বাড়ী থেকে নানা রকম খাবার তৈয়েরী করে এনে অমলকে খাওয়াত। কমলাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না।

একদিন অমল বললো—কী রে কমলা, তুই যে আমাকে এই ভাল খাবার খাওয়াস, এসব তৈয়েরী করতে খরচ আছে তো?

তা হোক খরচ। কমলা বলে। আমার মা তোমার জন্য তৈয়েরী করে দেয়।

বলিস কী? আমাকে তোর মা এতো ভালবাসে? আমি একদিন যাব তাঁর কাছে।

অমল কমলাদের বাড়ী এলো। কমলার মাকে দেখেই দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে 'মা-মা' বলে কাঁদতে লাগলো। কমলার মা অমলের মাথায় ও পিঠে হাত বুলাতে লাগলো।

কমলা ছুটে এসে বললো, তুমি কাঁদছো কেন অমল দা?

ওরে তা তুই বুঝবিনে। মায়ের এ কথায় কমলার চোখেও জল এল।

কালক্রমে অমল লেখা-পড়া শিখলো। বি. এ. পাশ করার পর একটি ব্যাঙ্কে চাকরী পেল। টাকা পয়সা যথেষ্ট খরচ করে। প্রয়োজন বোধে কমলাদেরকেও সাহায্য করে।

কমলাও বড় হয়েছে। দিনদিন সে অমলের প্রতি গভীর স্নেহশীলা হয়ে পড়লো। অমলকে ভালবাসলো। অমলের কাছে কমলা এলে অমল কমলার মুখের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকে।

একদিন কমলা বললো—অমলদা তুমি ও-রকম করে আমার দিকে তাকিয়ে থাক কেন? কী দেখ?

কী দেখি, জানতে চাস?

জানতে চাইব না?

দেখি তোর মুখের মধ্যে আমার মায়ের মুখ।

সে আবার কী? কমলা কেমন যেন অবাক হয়ে গেল।

হ্যাঁ, জানিস তো আমার মা নেই ছোটবেলা থেকে। মার মুখ কোন দিন দেখেনি। খুব ছোট বেলায় মা মারা যায়।

তাতে কী হয়েছে। অনেকেরই তো ছোট বেলায় মা মারা যায়।

তা যায়। কিন্তু আমার কথা আলাদা।

কী রকম?

আমি বিধবা মায়ের ছেলে। আমার বাবা কে ছিলেন তাও জানিনে। মাতৃপিতৃ হীন মানুষ। আমি সব মেয়েদের মুখে মা-র মুখ দেখি। ভাবি আমার মা বোধ হয় দেখতে এই রকম ছিলেন। আমার মা বাবার কোন সুঠিক পরিচয় নেই।

কমলার মাও কমলাকে একদিন বলেছিল: অমলের বিয়ে কি করে হবে? কে ওকে মেয়ে দেবে? ওর তো কোন পিতৃপরিচয় নেই। ওর মায়ের বিধবা অবস্থার সন্তান অমল। ওর জন্মের পরেই কিছু দিনের মধ্যে ওর মা মারা যায়। বাবার তো পরিচয়ই নেই, মাও চলে গেল। অমল সেই থেকে সর্বহারা। একজনের দয়াতে ও লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পেয়েছে। অমল প্রায়ই বলে,—আমি কোনো দিন কোনো মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে ভাবতে পারছি না। আমি সব মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল আমার মাকেই খুঁজছি। কবে আমার এই খোঁজার শেষ হবে জানি না।

শ্রীমতীর সৌজন্যে

মাণিক শেঠ

একেবারে সেই কাকডাকা ভোর থেকেই ছাতু-রুটি সঙ্গে নিয়ে চাকরির জন্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে হাজার হাজার বেকার যেন বাবা বেকারেশ্বরের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। যারা ঘুষ বা ঘুষির জোরে কিংবা কোন খুঁটির জোরে চাকরি-বাকরি জোটাতে পারেনি সেই সব হতভাগারা চাকরির আশায় হাজির হয়েছে। এবং হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে গেল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল তবু চাকরির খবর দেনেওয়ালাদের কারো কোন পাত্তাই নেই। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মহাপ্রভু অর্থাৎ কর্মকর্তারা এখনও হয় তো কেউ আসার অবকাশ পাননি। বোশেখ মাসের কড়া ও চড়া রোদে হতভাগা বেকাররা প্রায় বেগুন ভাজা হয়ে গেছে। কাঠ ফাটা রোদে তেষ্টায় অনেকের ছাতি ফাটার উপক্রম। প্রচণ্ড দাবানলে ক্লান্তি আর হতাশায় জন কয়েক হতভাগা ছট্‌ফট্‌ করছিল। আবার পচা ভটকা ও ভ্যাপসা গরমে কেউ কেউ প্রায় অন্তিম খাবিও খাচ্ছিল। এমনকি তেষ্টা মেটাবার জন্য সামনে সামান্য পানীয় জলেরও কোন ব্যবস্থাটুকু নেই। আবার রাস্তায় করপোরেসান্‌ না-চোরপোরেসানের কোন ট্যাপওয়াটার বা টিউবওয়েল থেকে হতভাগারা যে একটু তেষ্টার জল খাবে তারও কোন উপায় নেই। কারণ কবেকার সেই লর্ড ক্লাইভের কিংবা কোন মান্ধাতা আমলের টিউবওয়েলটা একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কর্তৃপক্ষের তা মেরামত করার চেষ্টা পর্যন্ত নেই। আর ট্যাপের (ট্যাপওয়াটারের) পেতলের কিংবা প্লাস্টিকের সামান্য কলের টুপিটা অর্থাৎ কলের মাথাটা···তাও হয়তো কোন অপদার্থ, পোড়ার মুখো, নিবংশে নেশাড়ু নেশাভাং-এর কড়ির জন্য বেমালুম হাতিয়ে নিয়েছে থুড়ি কোন গেড়ানন্দ গেঁড়িয়েছে।

দুপুর গড়িয়ে গেল কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন বেকারের নাম ডাকা হলনা। ঘন্টার পর ঘণ্টা অসহায় বেকাররা লাইন দিয়ে হা-পিত্যেস করে দাঁড়িয়ে আছে। এজন্যে কর্তৃপক্ষের কোন সৌজন্য বোধ বা সহানুভূতি তো দূরের কথা যেন দায়িত্ব বা কর্তব্য বোধটুকুও নেই। হঠাৎ গোটাকয়েক মোসাহেবসহ জন-কয়েক সুটেড বুটেড এবং হোমরা-চোমরা ব্যক্তি বেশ গটগটিয়ে অফিসের ভেতরে ঢুকে গেলেন। সেই সঙ্গে কেউ কেউ যেন ছিঁচকে চোরের মত ওদের পেছনে পেছনে প্রায় চড়াই পাখীর মত ফুড়ুত্ করে গলে গলে। এবং মওকা পেয়ে কর্তাদের কিছু ফাউ চ্যালা-চামচেরাও দিব্যি ঢুকে পড়ল। কোন রকমে বেঁচে বর্তে থাকার জন্য আশাবাদীরা অনেকেই আশা করছিল এবার হয়তো তাদের নাম ডাকা শুরু হবে। কাজ-কর্ম জুটলে ভাগ্যের চাকাটা ঘুরবে অর্থাৎ হতভাগারা জীবনও জীবিকার জন্য হয়তো একটা সঠিক ঠিকানা পাবে এবং ঘর ও ঘরণী পাবার অধিকার পাবে। কিন্তু ডাক আসবে আসবে করে ওদের ডাক আর আসেইনা। অবশ্য এ-ডাক্ অন্তিম ডাক কিংবা একেবারে ওপার থেকে নয় শুধু এপার থেকে অর্থাৎ মহামান্য আর মহানুভব চাকরি দেনেওয়ালা-দের কাছ থেকে।

বেকারদের লাইনের শেষপ্রান্তে জনৈক আধ-বুড়ো ভদ্রলোক পচাভ্যাপসা ও ভটকা গরমে প্রায় হাঁস-ফাঁস করছিলেন এবং মাঝে মাঝে যেন অন্তিম খাবিও খাচ্ছিলেন। অসহ্য গরমে মাঝে মাঝে উঃ আঃ করে তাঁর পালিশ করা উত্তপ্ত টাকে বার বার হাত বুলা-চ্ছিলেন। তখন বেচারী ঐ আধ-বুড়ো মানুষটার শোচনীয় অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল গনগনে আগুনে তেতে ওঠা তাওয়ার মত ওনার উত্তপ্ত টাকের ওপরে চাট্টি ধান বা চাল দিলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই খই কিংবা মুড়ি ভাজা হয়ে যেতো অনায়াসে।

লাইনে ও বেলাইনের মধ্যে গোটা কয়েক অপগন্ড ও অপদার্থ এবং ষন্ডা-গুন্ডা কারণে বা অকারণে আচমকা একটা ফালতু ঝুট-

-ঝামেলা পাকিয়ে তোলে। দেখতে দেখতে চেল্লা-চেল্লি গালাগালি আর ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। জন কয়েক উজবুক অতি রসাল ও আধুনিক ও অভিনব খিস্তি-খেউড়ও শুরু করেছিল। শেষে গুঁতোগুঁতি থেকে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। একে হতভাগা বেকাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে রুজি রোজ-গারের কোন আশা ভরসা না দেখে নিরাশ হয়েছিল এবং মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে গিয়েছিল। তার ওপর আবার লাইনে যতসব ফালতু ঝুট-ঝামেলা দেখে অনেকেই প্রচন্ড বোমকে গেল। এইসব লাফাংগাদের কেলোর কীর্ত্তি দেখে শুনে লাইনের ঐ আধবুড়ো লোকটা এতো খেপে গিয়ে ছিলেন যে, হারামজাদা উজবুকদের বেশ করে খড়ম পিটে কিংবা ঘা-কতক ছাতা-পেটা করে শায়েস্তা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু এমন সময় অকস্মাৎ ভিড় ঠেলে লাইন ভেঙ্গে এবং রং মেখে ও সঙ্ সেজে যেন এক অষ্টাদশী নৃত্যপটিয়সী প্রায় ঢেউ তুলে এগিয়ে এলেন।

আহা! যেমন তাঁর উগ্রপ্রসাধন তেমন উদ্ধত যৌবন। টগবগে ঘোড়ার মত চালচলন আর ঝোড়ার মত খোঁপা। তিনি প্রায় কাছির মত মোটা জবর একটা ফ্যাটা দিয়ে (দড়ি দিয়ে) চুল বেঁধেছেন। হিন্দি সিনেমার ফান্টুস নায়িকার মত শ্রীমতীর সাজগোজের বহর দেখে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে ম্যাজিকের মত লাইন-বেলাইনের সব হল্লাগুল্লা আর হুলো বেড়ালের মত ফোঁস্-ফোঁসানি একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল। প্রথম দর্শনে অনেকেই মুগ্ধও চমকিত দৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে চেয়েছিল এবং বোধহয় অনেকের হৃদয়ও দুলে উঠেছিল—একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীমতীর চোখে প্রায় থালার মত বিরাট রঙিন চশমা। গায়ে বগল কাটা বিরাট ও বিচিত্র এক আলখাল্লা। ডানহাতের কব্জিতে প্রায় জামবাটির মত অদ্ভুত ও কিম্ভুত একটা ঘড়ি। শ্রীমতীর শ্রীচরণে প্রায় ডজনখানেক নাট-বল্টু আঁটা পাঁচ-সাত কিলো ওজনের কাঠের গুঁড়ির মত হনলুলু কিংবা উজবেকিস্থানের আধুনিক খড়ম না কি একটা কিম্ভুত

কিমাকার পাদুকাচড়ে দুম্‌দাম্‌ পা ফেলে এবং দু-চার জনকে প্রায় জখম করে তিনি একেবারে সোজা সটান এগিয়ে গেলনএমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের অফিসের দিকে। মন মজানো এবং মন রাঙানো রঙিন প্রজাপতির মত শ্রীমতীকে দেখে সবাই একেবারে হাঁ হয়ে গেল। অনেকেই যেন লালসার চোখ দিয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগল—এই চম্‌চম্‌ মার্কা যুবতীকে।

তারপর ফিক্‌ করে হেসে ফস্‌ করে শ্রীমতী বললেন,—ভেতরে আসতে পারি স্যার? এমন মিষ্টি-মধুর বামা কণ্ঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে সবাই চমকিত ও পুলকিত হলো এবং একটু নড়ে চড়ে উঠলো। অনেকেই পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করলো এবং হয়তো কারো কারো মনও দুলে উঠলো। কেউ কেউ নয়নে ঝাড়ি কষে আবার কেউ কেউ জিভের লাল ঝোল সামলে নিয়ে যেন একেবারে হাঁ-করে নির্লজ্জের মত গোগ্রাসে গিলতে থাকে শ্রীমতীকে।

অফিসের ভেতরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ এই সাবধান ও সতর্কবাণী লটকানো ছিল অর্থাৎ বাহিরে ব্লাকবোর্ডের বুকে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ এই শব্দগুলি বেশ বড় বড় হরফে ও স্পষ্টাক্ষরে ফতোয়া জারি করছিল বলে পিওন ও কেরানী বাবুরা সংশয়ে ও সংকোচে কেউ কিছু বলতে পারছিল না। কিন্তু হঠাৎ ভেতর থেকে একজন তরুণ অফিসার প্রায় ছুটে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন শ্রীমতীর সামনে। ডবগা ছুঁড়ি দেখে তিনি যেন ধন্য ও কৃতার্থ হলেন এবং শুভদৃষ্টির মত এক ঝলক দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর বেশ ঘনিষ্ট হয়ে এবং অত্যন্ত মোলায়েম সুরে তিনি বললেন,—নিশ্চই-নিশ্চই, আসুন-আসুন ম্যাডাম। সোজা ভেতরে চলে আসুন। তাড়াতাড়ি একটা ঢোক গিলে আবেগে ও উচ্ছাসে এবং প্রায় উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, আপনারা আমাদের মা-বোন, আপনাদের দেখা-শোনা আমাদের কর্ত্তব্য তাছাড়া—লেডিস ফাস্ট, তাই আপনাদের জন্য দরজা সবসময়ই খোলা। নিয়ম-কানুন আর রীতি-নীতি উপেক্ষা

করে এবং আনন্দে ও আতিশয্যে কথাগুলি বলে দরদী ঐ তরুণ অফিসার ভদ্রলোক হাত কচলাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ শ্রীমতীকে এতো আদর-অভ্যর্থনা আর এমন অভিনব সংবর্ধনা ও কাণ্ড কারখানা দেখেশুনে লাইনের সেই সুযোগ-সন্ধানী টাকলু বুড়োটা যেন ওৎ পেতেই ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই ছাতা বগলদাবা করে লাইনের অনেককে প্রায় ল্যাং মেরে তড়িঘড়ি ধেয়ে এলেন তিনি।

ঐ দরদী তরুণ অফিসারের উদ্দেশ্যে ধান্দাবাজ বুড়োটা পরমানন্দে ফোগলা মুখে এবং এক গাল হেসে বললেন,—বাবা, আপনারা হলেন এ যুগের আদর্শ আর সত্যিকারের জনদরদী। তা বাবা, মা-বোনদের যখন এত উপগার করছেন তখন সেই সঙ্গে বুড়ো বাপ-ভাইদেরও একটা হিল্লে হবে নিশ্চয়ই....এই মোক্ষম কথাগুলি বলে একটু মুচকি হেসে ও ঝেড়ে কেশে ঐ জন-দরদী অফিসারকে কিছু বলার অবকাশ না-দিয়েই তিনি সোজা শ্রীমতীর পেছনে পেছনে একেবারে হুড়বড়িয়ে অফিসের ভেতরে ঢুকে গেলেন...। মনে হল যেন তিনি জীবন-সংগ্রামে জিতে গেলেন।

"যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীউমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

তাসের ঘর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

ছাদে উঠোনা পড়ে যাবে, রাস্তায় বেরিয়োনা গাড়ী চাপা পড়বে, ট্রেণে চেপোনা জীবন্ত সলিল সমাধি হবে, কিন্তু বাড়ীতে থেকোনা চাপা পড়ে পাতালে চলে যাবে এ ধরণের উপদেশ তো কারো কাছ থেকে শোনা যায়নি। আজ তা শুধু কানে শোনাই নয় এ পাপ চোখে হামেশাই দেখতে হচ্ছে। দোষ কারো নয় গো মা, নিশ্চয়ই নয়। আর একাই বা দোষ কে কবুল করে বলুনতো, দোষ যদি হয়েই যায় সে তো যৌথভাবেই হয়ে থাকে। কথায় বলে 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'। সরকারী বেসরকারী তদ্বিরকারী বকমারী কা'কে বাদ দেবেন বলুন তো। এমন কি যারা ধ্বসের শিকার হয়ে ইহলোকে থাকার ছেদ টানেন এবং যারা অর্দ্ধ পথ পেঁছে ফিরে আসেন তারাই কি কম দায়ী? তাদের উচিৎ পৌরদপ্তরের আগাপাছতলা অনুমোদন (লিখিত) সংগ্রহ করে তবেই গৃহ-প্রবেশ করা কারণ ঘাত-ঘোঁতের রহস্য তারা ছাড়া আর কেই বা জানবে? এমন কি স্বয়ং ভগবানেরও জানা সম্ভব কিনা জানিনা। তাছাড়া ন্যায়, সত্য-নিষ্ঠার পথিকৃৎ প্রমোটারবৃন্দকে জতুগৃহ নির্ম্মাণের অনুমোদন তো এই দপ্তরই দিয়ে থাকেন। এই ঐতিহাসিক মহানগরীর বুকে বেশ কয়েকটি বৃহৎ অট্টালিকা-চূর্ণ প্রত্যক্ষ করলাম যার শেষটী হল 'শিবালিক'। যারা বিনা দোষে অকালে চলে যান শুভানুধ্যায়ীরা তাদের বিয়োগে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, স্বার্থান্বেষীরাও কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন, আর আমরা যারা নিছক ছা-পোষা নিরীহ কতটুকুই বা এগোতে পারি। তবে হ্যাঁ, যেটুকু পারি তা হচ্ছে আগামী ধ্বংসের পর্বটি কবে বা কোথায় ঘটবে জানতে পারলে আর কিছু না হোক সেই দুঃখী-দুঃখিনীগুলোকে সময় মত গাছতলাতেও এনে

দাঁড় করাতে পারি যাতে বাপ-মায়ের দেওয়া প্রাণগুলো অন্তত বাঁচে। সুখের কথা বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় এমন কি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্য্যন্ত ইঃ ৭. ৯৫-এর কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসন বলেছেন তদন্ত হবে। এখানেও দ্বিমত, অবসর প্রাপ্ত না অনবসর। শাসকগোষ্ঠী চাইছেন তদন্ত একজন অবসর প্রাপ্ত ন্যায়াধীশ দিয়ে করানো হোক, বিরোধী গোষ্ঠী মত পোষণ করছেন অনবসর। যাই যোক না কেন ফলাফল যে শেষ অঙ্কে শূন্য এ বিষয়ে জনসাধারণ ওয়াকীফ। যেখানে আইন আছে আইনের প্রবর্ত্তক আছে কিন্তু আইন মোতাবেক চলবার কেউ নেই সেখানে তিলোত্তমা কাল্লোলিনী কলকাতার স্বপ্ন না দেখে বিশ্বকবির ভাষাতেই আসি "দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর" অর্থাৎ চাহিদা হোক পিতামহ, প্রপিতামহের দূরদর্শিতার পরিকাঠামো অনুযায়ী নির্মিত মোটা গাঁথুনির বাসস্থান যেখানে সুস্থির হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত থাকা যাবে। অন্তত ধ্বসে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা বা বেইমানি করবে না।

ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফেরা বিমলকুমার ভট্টাচার্য

অগ্নি যুগের বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র বসু। পিতা রঞ্জনবিলাস বসু, মা হলেন প্রভাসিনী দেবী। উভয়ই ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও অত্যন্ত প্রগতিশীল। জ্যোতিষ বাবুর পিতা যশোর জেলার কেশবপুর থানার অন্তর্গত ডোঙ্গাঘাটা গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাঁদের বাড়ীটি "দেওয়ান বসু বাড়ী" নামে বিখ্যাত। জ্যোতিষ বাবুর মাতামহ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলের জেলার। জেলের অভ্যন্তরে মাতামহের আবাসস্থলে ১৯০৮

সালে, ৭ই ডিসেম্বর জ্যোতিষ বাবুর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের মাত্র দুই-তিন মাস আগে এই জেলেতেই শ্রী অরবিন্দের মুরারী পুকুর বোমার মামলায় ধৃত বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হয়। বিপ্লবীদের এই ফাঁসির সময় তাঁর মাতামহ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

জ্যোতিষ বাবু শৈশবে মায়ের কাছ থেকে বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু ও ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে আত্মাহুতির কথা এবং স্বদেশী আন্দোলনে শহীদদের বীরত্বময় কাহিনী শুনে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রেরণা লাভ করেন। বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায় পড়ার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয় লাভ সূচক ব্রিটিশ সরকার যে "ভিক্টরি মেডেল" ছাত্রদের দিয়েছিলেন, জ্যোতিষবাবু তার ছাত্রবন্ধুদের কাছ থেকে তা নিয়ে তুচ্ছজ্ঞান করে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করে ছিলেন। এই অপরাধে সেদিন তাঁকে পাঠশালা থেকে বিতাড়িত হতে হয়। পরে তিনি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত "যশোর সম্মিলনী হাইস্কুলে" ভর্ত্তি হন। পরে ১৯২১ সালে গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকারি স্কুল ছেড়ে যশোরের "জাতীয় বিদ্যালয়ে" চলে আসেন। এই বিদ্যালয় থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় দেশের বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন, ফলে তাঁর পড়াশুনায় ছেদ পড়ে।

জ্যোতিষ বাবু ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। সিক্রেট সার্ভিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা সে সময় সাবমেরিনের সাহায্যে শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে শত্রু পক্ষের যে সামরিক তথ্য ও গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে ভারতবর্ষে পাঠাতো। নেতাজীর নির্দেশে বিপদের বিপুল ঝুঁকি নিয়ে তাঁর কলিকাতাস্থিত বাসভবনে রক্ষিত ট্রান্সমিটারের সাহায্যে তিনি সেইসব খবর গোপনে "আজাদ হিন্দ বাহিনী"র কার্য্যালয়ে

পাঠাতেন এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে এ সম্পর্কে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। বৃটিশ রাজত্বে বসে এ যে কী সাঙ্ঘাতিক দুঃসাহসিক কাজ, তা আজ ভাবাও যায় না। এই অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হন। ব্রিটিশ সরকারের বিচারে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। সৌভাগ্যবশত তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়েভেল ও মহাত্মা গান্ধজীর সহায়তার মৃত্যুদন্ড থেকে অব্যাহতি পান।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার সময় তিনি যশোর, খুলনা, রংপুর ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে দীর্ঘদিন বন্দী জীবন যাপন করেন। এই সময় বহু দৈহিক অত্যাচার ভোগ করেছিলেন। এক সময় তিনি ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে দুর্গম হিমালয়ে অবস্থিত ভুটানের এক নির্জন অঞ্চল লংকাপাড়ায় প্রায় দু'বছর আত্মগোপন করে থাকেন। যাঁদের সান্নিধ্য এবং উপদেশ তাঁকে জীবনে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে আছেন, মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সর্দার অমর সিংগীল, হরিদাস মিত্র, পবিত্র রায়, অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ, মেজর সত্যগুপ্ত, রসময় শূর, মহেন্দ্র সিং, সুরেন ঘোষ আচার্য্য কৃপালনী, মৃদুলাসারাভাই, শরৎ বসু, সত্যরঞ্জন বক্সী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামমনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ননিনাক্ষ্য সান্যাল প্রভৃতি।

১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীকেশকারের নির্দেশে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের ব্যবস্থাপনায় রেডিওতে বিপ্লবী জ্যোতিষ বাবুর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী বসন্ত শাঠের নির্দেশেও তাঁর জীবনের নানা তথ্য নিয়ে কলিকাতা দূরদর্শনে একটি সুন্দর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। জ্যোতিষচন্দ্র বসু জাতীয় স্বীকৃতি স্বরূপ 'তাম্রপত্র'ও পেয়েছিলেন।

যোগাযোগের কুমুদিনী ধীরা ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ উপন্যাসটিকে মর্যাদার লড়াই বলা চলে। চাটুজ্যে পরিবারের সঙ্গে ঘোষাল পরিবারের। মধুসূদন ঘোষাল এক পুরুষের বড়লোক। নিজের কর্মক্ষমতায় সে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়ে পুরনো বিবাদের সূত্র ধরে নিঃশেষিত চাটুজ্যে পরিবারের বড়কর্তা বিপ্রদাসের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। প্রতিশোধের মাধ্যম করেছিল বিপ্রদাসের কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদিনীকে বিবাহ করে। সারা যৌবনকাল মধুসূদন অর্থের পুজো করে এসেছিল, শেষ যৌবনে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন বোধে বিবাহের চিন্তা করে। লাঠিও ভাঙবে না আবার সাপও মরবে এই ভাবনায় সে চাটুজ্যে পরিবারের কন্যা কুমুদিনীকেই বিবাহ করা স্থির করে।

কুমুদিনী নিজ বংশ গৌরবে গর্বিতা। ধৈর্যশীলা, ভক্তিমতী দেবদ্বিজে বিশ্বাসী। সর্বোপরি বিশ্বাসী ও নির্ভরশীলা আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্রদাসের ওপর। বিপ্রদাস তার শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নয় তার গুরুও বটে। কুমুর জীবন-আদর্শের, তার পড়াশোনা ও সঙ্গীত-সাধনার গুরুও তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। কুমুদিনীর ওপর বিপ্রদাসের এই প্রভাব মধুসূদনের কাছে ছিল অসহ্য। মধুসূদন স্বভাবত কটুভাষী রুক্ষ স্বভাবের। নারীর প্রকৃত মূল্যায়ন করা তার পক্ষে কঠিন ছিল। সে ভেবেছিল বাড়ীর আর পাঁচজন পরিজনের মতই কুমুদিনী তার আদেশ বহনকারিণী অনুগতা। কুমুদিনীর স্বভাবের দৃঢ়তার সঙ্গে যতই মধুসূদনের পরিচয় হতে থাকল সে ক্ষিপ্ত থেকে ক্ষিপ্ততর হয়ে উঠল। মধুসূদনের ক্ষিপ্ততা কুমুদিনীকে উদাসীন করে তুলল, সে স্বভাবত ধীরস্থির। ক্রমশ সে আরও নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে চেষ্টা করে চলল। আপাত দৃষ্টিতে কুমুদিনীকে একটি ট্রাজিক চরিত্র বলেই মনে হয়। শৈশবে পিতা

মাতাকে হারান, অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে লেখাপড়া বন্ধ। তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা সবই তার জীবনকে দুঃখময় করে তুলেছিল। ঈশ্বর-বিশ্বাসী কুমুদিনী মধুসূদনের বিবাহ-প্রস্তাবকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলে মনে করেছিল। বিবাহের পর তার স্বপ্ন ভগ্ন হয়। ছোট খাট সকল ব্যাপারেই মধুসূদণ অশান্ত। কিন্তু কুমুদিনীর মধ্যে পর্বতের স্থিরতা, উত্তাপহীন শীতলতা মর্মস্পর্শী। নিজেকে সে স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে চায়। তার সংস্কার, বাল্যশিক্ষা, অভিজ্ঞতায় সে জানে স্বামী মেয়েদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরিস্থিতির এমন উদ্ভব হয় তখন সে না পারে নিজেকে সমর্পণ করতে না পারে অনেক দূরে সরে যেতে। গীতার বাণী স্মরণ করে বার বার সে নিজেকে সংযত করতে চায়। কিন্তু যখনই মধুসূদনের কাছ থেকে তার পরিবার বিশেষ করে তার গুরুস্থানীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিপ্রদাস সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কিছু সে শোনে তখনই তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, তার মধ্যে নেমে আসে কঠোর নীরবতা ও ঔদাসীন্য।

শেষ পর্যন্ত কুমুদিনীকে মধুসূদনের জৈব তাড়নার ডাকে সাড়া দিতেই হয়। আপাত দৃষ্টিতে এখানে কুমুদিনীকে মনে হয় মধুসূদনের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত। কিন্তু এখানেই কুমুদিনীর জয়। মধুসূদন তার বিপুল ধনসম্পদ রক্ষার্থে ও স্বীয় সত্তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুত্রার্থে বিবাহ করতে চেয়েছিল। এ জন্য সে যেকোন কন্যার পিতাকে তার বিপুল ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে কন্যাদানে সম্মত করাতে পারত। কিন্তু পুরুষ চরিত্রের একটি বিশেষ দুর্বলতা অবৈধ ভাবে সে শত সন্তানের জন্ম দিতে পারে কিন্তু যেখানে তার বংশ রক্ষা, বংশ ধারাকে বহন করা বা বংশের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার প্রশ্ন আসে তখন সে আপন বীর্যকে বহন করার জন্য সদ্বংশীয়া, কুল শীল মানে শ্রেষ্ঠ কোন সুন্দরী সৎস্বভাবা নারীরই সন্ধান করে। মধু-

সূদনের এই মানসিকতাই তাকে কুমুদিনীকে বিবাহ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এক পুরুষের ধনবান মধুসূদন নিজের বংশ মর্যাদার ন্যূনতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। কুমুদিনীর বংশের ঐতিহ্যের প্রতি মধুসূদনের ছিল প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস। তাই নিজ বংশধরের জননী হওয়ার জন্য কুমুদিনীর প্রতি মধুসূদনের ছিল মৌন অথচ আত্মম্ভরী আবেদন।

উপন্যাসের "যোগাযোগ" নামটিও এই প্রসঙ্গে সার্থক বলা যায়। শারীরিক সংযোগ যে সর্বদা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার করে তা কখনই সত্য নয়। তবে সন্তান তার পিতামাতার মধ্যে একটি মধুর সংযোগের সৃষ্টি করে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যদিও উপন্যাসে মধুসূদন ও কুমুদিনীর পরবর্তী জীবনের কোন উল্লেখ নেই, তথাপি এ আশা করা অমূলক নয়, অবিনাশ তার পিতা-মাতার ব্যবহারিক জীবনের সেতুবন্ধ ছিল নিঃসন্দেহে।

গৃহহারা ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়

মেলায় হারিয়ে যাওয়া শিশুটির মুখ দেখিনি আমি
সে শুধু তার হাতের পাতা
রেখেছিল আমার হাতে,
সে বাড়ি যেতে চায়নি,
বলেছিল
'তোমার বাড়ি যাবো আমি।'

খোকা, আমার বাড়ি ত অনেকদিন হারিয়ে ফেলেছি আমি
এখন আমার চারদিকে শুধু অন্ধকার কুয়াশা ;
বাড়ির খোঁজে ব্যস্ত পায়ে আমি ছুটে গেছি
দূর থেকে দূরে ;
আকাশের মেঘলা চাদর সরিয়ে তুলে আনতে চেয়েছি
এক টুকরো আলোকের বাসা,
সমুদ্রের গভীরে সাঁতার দিয়ে চিনতে চেয়েছি
আমার ছোট্ট প্রবালের ঘর,
জঙ্গলের আনাচে-কানাচে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি
হারিয়ে যাওয়া একটা খড়কুটোর ডেরা ;
কিন্তু অন্ধকার হ'য়ে যাওয়া সেই ঘরটার
এখনও কোন সন্ধান পাইনি আমি।

শিশুটি বুঝতে চাইল না কিছু,
সে শুধু আমার আঁচল টেনে ধরল,
চোখ রাখল আমার অসহিষ্ণু পায়ে
ঘ্যানঘেনে গলায় শুধু বলতেই থাকল
'তোমার বাড়ি যাবো,
তোমার বাড়ি নিয়ে চল আমাকে।'

এখনও এখনই বিউটি মজুমদার

এখনও সে সব দিন ভীড় করে আসে।
রোদের মত উদোম, বৃষ্টির মত দামাল
হাওয়ার মত সহজ, আকাশের মত লাগামছাড়া।
এখনও মাটির মত একান্ত আপন হয়ে
ধরা দেয় ওরা,
অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সোঁদা গন্ধ নিয়ে।
মাটির সে ঘ্রাণে—
আমার বুকের উঠোনে অঘ্রাণের নবান্ন।
সে গন্ধের স্বচ্ছতায়
বুক ফুলিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিলে
প্রসারিত বুকে অনেক মানুষের ঠাঁই
বর্ণহারা নাম গোত্রহীন নগ্ন একেবারে।
নবান্নের ঘটা, নিমেষে উৎসব।

এই সময়টাতেই একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা।
নইলে এখন বাতাসে বারুদের ঝাঁঝ
রোদে বিদ্বেষের গরল তাপ।
বৃষ্টিতে লোনা স্বাদ—অশ্রুর।
মাটিতে রক্তের বদবু—আত্মীয়ের।
উঃ, কী দম-বন্ধ করা এই রোদ বৃষ্টি মাটি!
এখন নবান্ন কই?

শুধু নরমেধ যজ্ঞ দয়াশূন্য বলির।
এখনই, হ্যাঁ এখনই চাই দুরন্ত তাণ্ডব নাচ
যজ্ঞনাশকারী স্বয়ম্ভু শিবের।
খণ্ডিত সততা সতীপীঠ গড়ুক বিশ্বের বেদীতে,
ভালোবাসার জয়ধ্বনি উঠুক।
উলঙ্গ পরাণ নিয়ে মানুষ বাঁচুক।

শান্তির তপোবনে কাব্যিক শক্তি অশোক সাহা

পার্থিব কোন শক্তির নাই কোন মুক্তি
শুধু আছে আবর্তের প্রসারতা,
জন-অরণ্য হতে দূরে—
শান্তির তপোবনে তোমায় লভিনু রবিতীর্থ ভূমে কম্বাসনে
জীবন-সায়াহ্ন পারে হারায়ে না-হারা
অসীমের সীমানায় তুমি ধ্রুবতারা।

তুমি অঙ্কুরিত কিশলয় সৃষ্টির আবহে—
পুষ্পিত জীবন তব কাব্যিক মহীরুহে।
আজি তবুও হেরি অজস্র অশ্রুকণা
অন্তস্থল হতে কাব্যিক মেঘমালা।
তব পদপ্রান্তে আজি আঁকি এ স্মরণিকা
একাকী বিহন মনে রাগিণীর সুর তানে
তোমারি ভাবুক মনের কাব্যসুধা সিঞ্চনে
তোমায় ভুলিনি কভু ভুলব না কবি।
বিস্মৃতি হবে না মনে তব প্রতিচ্ছবি.
তোমারই সৃষ্টির লয়ে মনোবীনা বাজে।

সখী সংবাদ সুধা চট্টোপাধ্যায়

মধুর হাসি হাসিল যবে সুখী,
হৃদয় মম উঠিল সুধায় ভরি,
চটুল চাহনি নিমেষ হরি নিল,
আবেগে হিয়া কাঁপিল যে থরথরি
রক্ত অধর, কুন্দ দন্ত পাতি
চাঁদের লাবনী, ছিনায়ে আনিল কেবা।

নিরজনে বসি গড়িল ও বরতনু
বুঝি কল্পলোক-বাসী যেবা।
অমিয় বচনে সিক্ত করিল না,
চির বন্দিনী, করি নিল বুঝি মোরে,
চতুরা সে নারী বটে
অমিত বুদ্ধি দিয়াছিল বিধি ঘটে,
কাব্য কুসুম চয়ন করিয়া আনি
মালা গাঁথি কুতুহলে,
প্রীতি উপহার খানি,
আজি পরানু তাহারি গলে।

অভিমান হরিকুমার ভট্টাচার্য

বলে ছিলে তুমি আমায়
দুঃখ কখন দেবে না,
তবে কেন হায়, দুঃখ আমায়
এত সহিতে হয়।
ধূপের মত জ্বলেও নিজে
ভরিয়েছি তোমায়. আমার সুবাসে
কেমন করে তবে তুমি
ভুলে গেলে আমায় সহজে।
বাসি মালা করে, ধুলায় দিলে ফেলে
আসে না কোন ভ্রমর যেথায়
দূর হতে তারা করে যায়
কানাকানি দেখে আমায়।
বলে ছিলে তুমি দুঃখ কখন
দেবে না আমায়॥

দরদী কবি শক্তি নিতাইচন্দ্র দত্ত

নম্রচিত্তে শ্রদ্ধা জানাই, জানাই তাঁরে ভক্তি।
চলে গেলেন ওপারে দরদী কবি শক্তি॥
উপর থেকে দেখলে তাঁকে মনে হত রুক্ষ।
অনেক অভিমানে লেখেন, "নিরুপমের দুঃখ"॥
পেয়েছেন অনেক জ্বালা, পাননি উপশম।
তাই লিখেছেন কবিতা, নাম তাঁর "যম"॥
ওই কবিকে বলি আমি সারা জীবন বাঁচো।
"কুয়োতলা"-য় এসে ডাকো, "অবনী বাড়ী আছো"?
জানি না ওই শক্তিকে আর পাবো কি না পাবো!
বলেছিলেন—"যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?"
তবুও তিনি গেলেন কেন, ভেবে নাহি পাই।
মনে হয় "দাঁড়াবার জায়গা" নেই তাই॥
ওঁর মৃত্যু মনকে করে বড়ই উচাটন।
চলে গেলেন বিষুধবারে, শান্তি নিকেতন॥

বেলা শেষ গৌতম সরকার

আমি তো চলেই যাব
শীতের ঝরা শিউলির পথ ধরে।
তারও অনেক আগে
হেমন্তের ধান কাটা হবে শেষ।
সরু সরু বিজলীর তারে;
বসবে নিঃসঙ্গ ফিঙ্গে।
কাটা ধানের শেষটুকু জানাবে অভিযোগ
তাদের সন্তান গেছে চুরি
তেমনি আমারও শেষ হেমন্তকালে।
কিন্তু কোন অভিযোগ নেই।

তারপর অঘ্রাণের পরিচ্ছন্ন আকাশে,
যেখানে হাজার তারা জ্বলে।
তারই নীচে শুয়ে থাকব আমি।
ঝরা শিউলির পাশে।
শিশির পড়বে ঝরে আমাদের গায়।
শিশির কিংবা প্রিয়ার চোখের জল।
দুই হতে পারে।

অনুরাগে ছড়া-পত্র

মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

সিলেট থেকে লিখছি আমি
কল্‌কাতাতে কল্‌কাতাতে,
লিখবো আমি লিখেই যাবো
কার কী এসে যায় বা তাতে।

ওখানটাতে লিখে আমি
শান্তি অনেক পাচ্ছি খুঁজে,
বাংলাদেশের সিলেট জেলায়
পড়ে আছি চক্ষু বুজে।

ওখান থেকে প্রণয় দাদা *
পত্র লিখলো আমার কাছে,
হয়তো আমার পত্রগুলো
উনার হাতে জমা আছে।

ওখান থেকে লিখে থাকেন
আরো অনেক প্রাজ্ঞ জনে—
তাদের কথা যায় না ভোলা
জেগেই থাকে আমার মনে।

আমার দেশে লিখে আমি
তৃপ্তি তেমন পাই না কেনো,
'নিজের দেশে পরবাসী'
এই অভাজন আমিই যেনো।

তিনটি দশক পার হয়েছে
লিখছি আমি যাচ্ছি লিখে,
জানি না, আর কতোদিন
কলম নিয়ে রইবো টিকে।

আমার লেখার বিষয় হলো
মানুষ-মানুষ-মানবতা,
সহজ ভাষায় বলছি আমি
নেইকো এতে ভাণ-ভণিতা।

অনুরাগের পাঠক যাঁরা
তাঁদের জানাই প্রাণের প্রীতি
আজ তা-হলে এখানটাতেই
পত্র লেখার টানছি ইতি।

* শ্রী প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কার ভয়ে ?

বিষাণ রুদ্র

ঘাড় ঝুঁকে আসে
মেরুদণ্ড বেঁকে যায়
মাটিতে লুকোতে চায় মুখ
করে ভয়ে ?
যার পয়েসা আছে
যে ধার দ্যায়
যে খায় সুদ।

গানের ভিতর দিয়ে

অমর চক্রবর্তী

গানের ভিতর দিয়ে
ভুবন দেখার সাধ এখনো যায় নি আমার
যাবেও না

গানের ভিতর দিয়ে
অনর্গল মানুষের স্বপ্ন কণ্ঠ শুনি
সেই স্বপ্ন আমায় ভিজিয়ে দেয়

গানের ভিতর দিয়ে
করুণার-অশ্রু ফুল হয়ে ঝরে
বেদ পাঠ আর ভোরের আজান
শিল্পের মাঠে খেলা করে

গানেরভিতর দিয়ে
কোমল গান্ধার নারী লাজুক হার
বদল করে নদীর সাথে, আমি দেখি

গানের ভিতর দিয়ে
তোমাকেই খুঁজে পেতে চাই
হে মাতৃভাষা, ঈশ্বর, রবীন্দ্রনাথ।

কৈশোর অতীন্দ্রচন্দ্র রায়

সেদিন বুঝলে পৃথিবীটা কেমন,
দেখলে, হিংসার বীভৎস রূপ,
আততায়ীর আয়ুধ ;
লুকালে আমার কৈশোরকে
আপন হৃদয়ে,
আমি ও অনুরূপ,
তারপর, যে যেদিকে পারি ছুট্।
দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, তোমরা খুঁজলে অভিজ্ঞান,
আমাদের কৈশোর,
শচীতীর্থে মীনের উদরে।
কৈশোরের মেরু-অবস্থান
তির্য্যক আলোয়,
রামধনুর সরস্বতী রূপ
অপরূপ,
উঁকি দেয় তোমার কবিতায়।

মহাজীবন রণজিত মিত্র

সম্ভ্রান্ত মন নিয়ে আমরা বোতলে সাঁটি
রক্তের লেবেল
ধর্মের মুখোশ পরে স্নায়ুযুদ্ধে বাঁচি।
চেতনার রঙে মনে প্রশ্ন জাগে তবু
"বড় কোন্ অধিকার ?
রক্তের, না মনের"
সচেতন বোধ লোপ পায়, বোকা হয়ে যায় এ মনন
না কি বোকামির ভান করে হেঁট হয় মাথা
ধর্ম অহং বোধে।

বুভুক্ষু জীবন তবু আজো বাঁচে বাঘবন্দী খেলায়
সংসার যাপনে
বিবেক দংশনে তার ভেঙে পড়ে মন
সংস্কার বোধ ঝেড়ে খুঁজে পায় মানুষ
তার মনের অধিকার
বিশ্ব বাড়ায় হাত উদারনীতিতে
জানি না, কোন্ ধর্মের প্রলেপে মোড়া ছলের আশ্রয়।

হে মহাজীবন
মানুষের ভালোবাসা ব্যর্থ যদি হয়
ব্যর্থ-সব কৃষ্টি, না কি ভ্রান্ত রাজনীতি।